জুলাইয়ের অশেষ পাখিরা

মঈন শেখ

ঐতিহ্য

লেখকের কৈফিয়ত

চব্বিশের জুলাই ও আগস্টের প্রথম ক'দিন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের কারণে বাংলাদেশ হয়ে উঠেছিল অগ্নিগর্ভ। দেশ আক্ষরিক অর্থেই যেন এক মৃত্যু-উপত্যকা পার করে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে। এমন রক্তক্ষরা একাত্তর-পরবর্তী সময়ে কেউ দেখেনি স্বাধীন বাংলাদেশে। সরকারি চাকরিতে বৈষম্যমূলক কোটা সংস্কারের আন্দোলন প্রথমে অহিংস থাকলেও পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রীর নানা দম্ভোক্তি, একগুঁয়েমি এবং পরে নিরীহ ছাত্রদের ওপর তার দলের পেটোয়া বাহিনী ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সহিংস আক্রমণের কারণে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে পড়ে। আর এটি মূলত দাবানল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ১৬ই জুলাইয়ের পর; বিশেষ করে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদকে গুলি করে মারার পর। গুলি করে মারার ভিডিও ফুটেজ নিমিষেই ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। ফুঁসে ওঠে দেশ। আসলে মোটা দাগে দেশ ভাগ হয়ে যায় দুইভাগে। একদিকে ক্ষমতাসীনরা আর অন্যদিকে ছাত্র-জনতা; বৃহদার্থে বাংলাদেশ। ছাত্র-জনতার ৯ দফা ঠেকে ১ দফাতে— প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ। এই আন্দোলনে যোগ দেন সাধারণ জনতা, কিশোর-কিশোরী, অভিভাবক, শিল্পী, শ্রমিক ও পেশাজীবীরা। নানা ঘটনা-উপঘটনার জন্ম দিয়ে টানা রক্তক্ষয়ী জীবনক্ষয়ী ৩৬ দিন পার করে আসে ৫ আগস্ট। আবু সাঈদ, সাগর, মুগ্ধ, আহ্নাফ, ইয়ামিন, জিহাদ, রিফাতসহ দেড় হাজারের অধিক শহিদের দামে, ২৫ হাজারের অধিক আহত ছাত্র-জনতার রক্তের দামে, কয়েকশতজনের চিরতরে পঙ্গুত্ববরণের দামে, চিরতরে অন্ধত্ববরণের দামে; এলো এক নতুন ভোর। কবি সাজ্জাদ শরিফ এই ভোরকে বলেছেন, 'রক্তরঞ্জিত ভোর'। সাবেক প্রধানমন্ত্রী পালিয়ে যান ভারতে। লাখো ছাত্র-জনতা দখল করে গণভবন ও সংসদ ভবন।

শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে সারা দেশের ফুঁসে ওঠা প্রকৃত প্রস্তাবে শুধু এই ৩৬ দিনের ব্যাপার ছিল না, ছিল দীর্ঘ ১৫ বছরের শ্বাসরোধী স্বৈরাচারী শাসন। ভোটাধিকার ও বাক্‌স্বাধীনতা হরণ, মানবাধিকার লঙ্ঘন, ব্যাপক দুর্নীতি, ব্যাংক লুট, হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার, আয়বৈষম্য, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করা ছাড়াও বিবর্তনমূলক আইন, গুম, খুন ও নানা হয়রানির মুখে নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যম হয়ে পড়েছিল কোণঠাসা। সবাই যেন মোক্ষম সময় খুঁজছিলেন সরকারের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার। সেই সুযোগ করে দিলো ছাত্রদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন। ঝাঁপিয়ে পড়লেন সবাই। উদিত হলো নতুন দিনের সূর্য। বিষয়টি সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী 'আমার দেশ' পত্রিকার ২২ ডিসেম্বর ২০২৪ সংখ্যায় বলেছেন আরো সহজভাবে। তিনি বলেছেন, "যে সরকারকে জনগণ এবার বিতাড়িত করল, সেই সরকারের মতো নিষ্ঠুর ও বধির সরকার আর আগে যায়নি। এই সরকার কোনো আইনকানুন মানেনি, নিষ্পেষণের জন্য নতুন নতুন আইন ও বিধি জারি করেছে, গুম করেছে, হামলা ও মামলা দিয়ে হয়রানির একশেষ ঘটিয়েছে এবং কতটা যে নির্মম হতে পারে, তার প্রমাণ দিয়েছে পতনের আগের কয়েকটি দিনে।" সেদিক থেকে লেখক হিসেবে এই গল্পগ্রন্থ আমার অংশীদারিত্বের বয়ানও বলা যেতে পারে।

আমার এই গল্পগুলো অধিকাংশই সময়ের, আবার কিছু অসময়েরও, যার বিষয় ও কাহিনি সবারই জানা। ফলে লেখকের বিড়ম্বনা কিছুটা আছে। যখন গল্পগুলো আগে থেকেই পাঠকের জানা থাকে তখন তা সংগত কারণেই গল্প হিসেবে পানসে ঠেকতে পারে। এগুলোর ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটবার সম্ভাবনা থাকাটা অসম্ভব নয়। পাঠকসত্তার স্বভাব হলো, বর্তমানে পঠিত গল্পের লেখককে তার লেখা অন্য গল্পের লেখকের সাথে মিলাতে চান। আগের পড়া থেকে উতরানো গল্প হলে লেখক বাহবা পান, আর মনে না লাগলে লেখকের প্রতি ঋণাত্মক ধারণা জন্মে। সেসব ঝুঁকি নিয়েই গল্পগুলো লিখেছি। আর তা লিখছি দায়বদ্ধতা থেকে, জুলাই আগস্টের সকল যোদ্ধা, সহযোদ্ধা ও শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা থেকে। অধিকাংশ গল্প লেখা হয়েছে জুলাই-আগস্টের শহিদদের নিয়ে। চরিত্রগুলোও হুবহু। সেই ক্ষেত্রে লেখকের সীমাবদ্ধতা কিছুটা থাকে। ইচ্ছা করলেও লেখক তা অতিক্রম করতে পারেন না। কাজেই লেখকের অন্যান্য গল্পের সাথে এই গল্পের কিছুটা ফারাক ঘটাটাই স্বাভাবিক।

গল্পগুলো পড়ে পাঠক বলতে পারেন, এগুলো ঘটনার ধারাবর্ণন কিংবা ইতিহাস, কিংবা রিপোর্টিং। এই বলাতেও আমি সার্থকতা খুঁজব। আবার

খুঁজব, না বললেও। আসলে পড়লেই সার্থকতা। তবে আমার বিশ্বাস ২০ বছর পরে নতুন পাঠকের কাছে এগুলো পানসে ঠেকবে না, যেমন ঠেকে না ভাষা আন্দোলনের গল্প, মুক্তিযুদ্ধের গল্প। আবার এমনও হতে পারে, গল্পগুলো পাঠে বিশ বছর পরের প্রজন্ম চমকে উঠবে; তারা এই ঘটনাগুলো স্বচক্ষে দেখেনি কিংবা দেখলেও ভুলতে বসেছে বলে। কারণ আমাদের রক্তে ভুলবার দোষ আছে। লম্বা সময় পরে হয়তো লেখক নিজেও চমকে উঠতে পারেন, বাংলাদেশে একবিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্র আর উন্নয়নের ধ্বজাধারীদের দ্বারা এমন হত্যাকাণ্ড কখনও ঘটেছিল বলে!

পরিশেষে মনে হলো, প্রতিটি গল্পের শিরোনামের পরেই রক্তাক্ত বাংলাদেশকে নিয়ে রচিত কবিতা থেকে কিছু লাইন যোগ করা যেতে পারে। আরো বেশি করে তা মনে হলো আবদুল হাই শিকদারের ১৪টি কবিতা পড়ে। কবিতাগুলো প্রকাশিত হয়েছিল 'আমার দেশ' পত্রিকার চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান সংখ্যার বিশেষ ক্রোড়পত্রে 'অবরুদ্ধ রক্তাক্ত বাংলাদেশের কবিতা' শিরোনামে (২২ ডিসেম্বর ২০২৪)। তাছাড়া কবিতাগুলো আমার গল্পের সাথে মানানসই। শেষেরটা বাদে সব কবিতাই আবদুল হাই শিকদারের কবিতা থেকে দেওয়া হলো। আশা করি পাঠকেরও ভালো লাগবে।

মঈন শেখ
জানুয়ারি ২০২৫

গল্পক্রম

রেড পয়েন্ট ১৩
কালো মেহেদি ২০
রোদের ছায়া ২৮
মুগ্ধর জুতা ৩৭
বীজবৃক্ষ অথবা পানির ফেরিওয়ালা ৪৪
ফেরারি জোনাকি ৫২
পরশবারুদ ৫৮
আবু সাঈদ ইনফিনিটি ৬৪
শেষ মিছিল ৬৯
পুলিশ কর্তার ছেলে ৭৮
আগস্টের আহনাফ ৮৬
ইয়ামিন ইলিশ মাছের মতো ছিল না ৯৬
দাঁত ১০২
খোঁজ ১১০
জুয়েল যেভাবে সুস্থ হইল ১১৯
জেগে ওঠে আল ১২৭

"দিকে দিকে বাজে ক্রুদ্ধ দামামা
কালবৈশাখি ঝড়
আসবেই জয় জয়ের নিশান
ঊর্ধ্বে তুলে ধর"

–রক্তের আগুন

রেড পয়েন্ট

এনতাজ আলীর ঘাম তখনো শুকায়নি। মুখে পানির ঝাপটা দেবার জন্যে পানির ফোঁটাগুলোও ঘামের মতো লাগছে। তবে শরীরের ভেতরটা তখনো স্যাঁতসেঁতে। সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন। নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত। নগদ দলীয় প্রার্থীর সাথে ভিড়ে আছে। এই ওয়ার্ডের একটা বিশেষ দায়িত্ব পেয়েছে এনতাজ— এলাকার যুবকদের হাত করা আর তাদের দিয়ে বিশেষ বিশেষ কাজ করানো। যেমন পোস্টার দিয়ে সমস্ত এলাকা ঢেকে দেওয়া, বিরোধী পক্ষের পোস্টার লাগানোর সুযোগ না দেওয়া, বিশেষ বিশেষ তথ্য সংগ্রহ করে দলীয় পুলিশকে দেওয়া। বিরোধীদলের ছেলেদের নামের বেনামি মামলাগুলো চাঙ্গা করতে পুলিশকে সাহায্য করা ইত্যাদি। আসলে পুলিশের পাশে আছে তারা সব সময়। পুলিশ যতটা জনগণের পাশে আছে, তারা পুলিশের পাশে আছে তার অধিক। তাদের দলীয় শপথবাক্যগুলোর মধ্যে এটাও একটি বাক্য, 'আমরা পুলিশের পাশে আছি সব সময়।' তারা পুলিশের পরম বন্ধু।

ডাইনিং টেবিলে বসেছে সবাই। সবাই বলতে তিনজন। এনতাজ, তার ছেলে কিরণ আর বউ নাহার। মেয়ে রাখি এখন শ্বশুরবাড়ি। ছেলে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে মাস্টার্স করেছে তিন বছর হলো। বাপের স্বপ্ন ছিল, ছেলে নামকরা সাংবাদিক হবে। টকশোতে অংশ

নেবে। বড় বড় সাংবাদিকের সাথে, বুদ্ধিজীবী কিংবা বাঘা রাজনীতিবিদের সাথে তর্ক করবে। ঘাম ঝরাবে যুক্তিতক্কে। রাত বারোটার পর মুখে পান গুঁজে খাটের নকশার দিকে রাখা বালিশে পিঠ ঠেস দিয়ে মজা করে শুনবে। বউ নাহারও সুড়সুড় করে এসে পাশে বসবে। যে নাহার টকশোকে এতদিন বলে এসেছে বকবকানি আর স্বামীকে রাগ দেখিয়েছে ঘুম কামাইয়ের জন্য, সেই নাহারও বাহবা দিবে ছেলেকে। কিন্তু হলো না কিছুই। পরীক্ষা, ভাইভা দিয়েছে অনেক। চাকরি হয় না। অবশেষে হয়েছিল একটাতে। দেশের প্রথম শ্রেণির এক বেসরকারি টিভিতে। গতকাল সেখান থেকে চলে এসেছে। একেবারেই এসেছে। হয় তারা বিদায় দিয়েছে, নয়তো কিরণ নিজেই বিদায় নিয়েছে। এ নিয়ে বাড়িতে কোনো কথা হয়নি। কিরণ শুধু বলেছে, চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে এলাম। এ নিয়ে যা একটু কথা হয়েছে বাবা-মা'র মধ্যে। ছেলের সাথে হয়নি। এনতাজ আলী যে সময় পেয়েছে, তাও নয়। তবে এনতাজ ও নাহার দু'জনেই খেয়াল করেছে, তাদের ছেলে কিছুটা ঝিমধরা হয়ে গেছে। দশটা প্রশ্নে একটা উত্তর দেয়। খাওয়াতে তার কত বাতিক ছিল— এটা খাবে না সেটা দাও, ঝাল বেশি হয়েছে, লবণ কম হয়েছে— কত রকম বিপত্তি খেতে বসে। এখন আর কোনো কথা নেই, মুখের সামনে যা দেওয়া যায় তাই খায়। আজকেও সেভাবেই খাচ্ছিল কিরণ। মাথা গুঁজে, বলতে গেলে মজা করেই খাচ্ছে সে। এনতাজ মুখের ভাতগুলো খালি করে কিরণের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সিটি নির্বাচন নিয়ে এমন উৎসব এর আগে কোনোদিন হয়নি, বুঝলি?'

- তাই বোধ হয়। বাবার দিকে না তাকিয়ে উত্তর দিলো। প্লেটের টেংরা মাছের কাঁটা থেকে মাংস আলাদা করাতেই তার বেশি খেয়াল। এনতাজ হতাশ হলো। ভেবেছিল এ বিষয় নিয়ে কিছুদূর আগাবে। ছেলের যোগান না পাওয়াতে সেটি হলো না। তাকেও প্রসঙ্গ ঘোরাতে হলো।

- হ্যাঁ রে, তুই যে কাল ঢাকা থেকে এলি, কিছু তো বললি না?

- চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি বাবা।

- তা অবশ্য আমি জানতাম। তুই বেশিদিন থাকবি না সেখানে। তা তুই ছাড়লি, না তারা তোকে তাড়িয়ে দিলো।

  কিরণ কোনো উত্তর দিলো না। ভাতও মুখে তুলল না। হাত প্লেটে রেখে বসে থাকল। মা ছেলেকে আন্দাজ করতে পেরে স্বামীর ওপর মৃদু রাগ দেখালো।

- থামো তো, খেতে বসেও তুমি খোঁচা মারতে কম করো না। তবে কি জানিস বাবা। নাহার ছেলের দিকে মুখ ঘুরাল।– আমি স্বপ্ন দেখতাম, তুই টিভির টকশোতে বড় বড় সাংবাদিকদের সাথে তর্ক করবি। তাদের ঘায়েল করবি কথার প্যাঁচে ফেলে।

- না মা, ও কাজটিও আমার দ্বারা হতো না। অমন তোষামুদে আর তেলমারা সাংবাদিক আমি হতে পারব না।

- দুনিয়ার সব সাংবাদিক মাথা বিক্রি করা, তুই একাই সত্যবাদী জিলানী। টকশোতে যারা আসে তারা সবাই তেলমারা, না? এনতাজ অনেকটা রেগে গেল।

- না, সবার কথা বলিনি তো। তবে অধিকাংশই লেবেনচুষ পাগল। কিরণ তরকারির বাটি থেকে এক চামচ ঝোল তুলে নিলো। খাওয়াতে মনোযোগ দিতেই এনতাজ আবার বলল, আচ্ছা হয়েছে, কিন্তু এত সুন্দর একটা চাকরি তুই ছাড়লি কেন বল তো। এনতাজের কথাতে এবার কাতরতা প্রকাশ পেল।

- ঘটনা অন্যকিছু নয়, আমার চাকরিটা খেল তোমাদের এই সিটি নির্বাচন।

- আমাদের মানে, আমাদের এই সিটির নির্বাচন? এনতাজ চেয়ার বদলিয়ে কিরণের পাশেরটাতে বসল।

- না এটার জন্য নয়। এনতাজের আগ্রহে কিছুটা ভাটা পড়লেও শোনার জন্য কান খাড়া করে থাকল।

- শোনো আব্বা, আমার ধারণা ছিল, বেশিরভাগ স্যাটেলাইট চ্যানেলই নিরপেক্ষ। অন্তত যে টিভিতে আমি গেলাম, সেটা সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল খুবই উচ্চ। কিন্তু যোগদান করে ভুল প্রমাণিত হলো। বিশেষ করে সিটি নির্বাচনের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে।

- কেন, তোকে দলীয় ছেলেপেলে তাড়ানি দিয়েছে নাকি?

- সেটা হলেও মনে সান্ত্বনা পেতাম। দলীয় ক্যাডার এমনটি করতেই পারে। কিন্তু আমাকে সংবাদ সাজাতে হবে টিভি মালিকের মন মতো। বলতে পারো কোনো একটা দলের মন মতো। এই যেমন তোমরা বিরোধীদের পোস্টার মারতে দিচ্ছ না, কর্মীদের এলাকাতে প্রচারণা করতে দিচ্ছ না। এগুলো আমাদের সরাসরি বলা যাবে না। আমি যেমন সেখানে দেখলাম বিরোধীদের, বিশেষ করে পোলিং এজেন্টদের অনেকের বাড়িতে গিয়ে আগের দিন রাতে শাসিয়ে আসা হচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুলিশ

পাঠানো হচ্ছে। কোনো কোনো ভোটকেন্দ্র থেকে পোলিং এজেন্টকে বের করেও দেওয়া হয়েছে। অথচ সেগুলো আমাকে সরাসরি বলা যাবে না। বলতে হবে বিরোধী প্রার্থী এসব বিষয়ে অভিযোগ করছেন। নিজের বিশ্লেষণের কোনো ক্ষমতা নেই। শালার সাংবাদিকতার কী বলেছি! কিরণের ক্ষোভটা যেন প্লেটের ওপর পড়ল। মাছ ভাঙতে গিয়ে নড়ে উঠল প্লেট।

- বর্তমান জামানাতে এক-আধটু মানিয়ে না চললে টেকা যাবে না রে বাপ। তা যেখানেই হোক।

- না আব্বা, অন্তত সাংবাদিকতা পেশায় আমি তা পারব না। তার চেয়ে বেইমানির কাজ বোধ হয় দ্বিতীয়টি নেই। তাছাড়া এমন সাংবাদিকতা আমাদের এইট পাশ রঘুনাথও পারবে। সাংবাদিকতায় পড়াশোনার দরকার কী?' এনতাজ আলীর কথা বাড়াতে ইচ্ছা হলো না। ছেলের কথা শুনে তার মনটাও খারাপ হলো এবার।

- বাপ, ওসব কথা এখন থাক। রিজিক যেখানে আল্লা রেখেছে সেখানে হবে। এবার আমার কথাটা মন দিয়ে শোন বাপ। তোকে এলাকার মানুষ খুব ভালোবাসে। তোর কথা শোনেও দেখি। তুই কম বুঝের মানুষদের এ কথাটা বোঝা। ক্ষমতাসীন দল থেকে মেয়র নির্বাচিত হলে এলাকার উন্নয়ন দ্রুত হবে। তারা যেন গতবারের ভুলটা আর না করে।

- আব্বা থামো। মাছের স্বাদটাই নষ্ট করে দিলে।

- তোর কাছে মাছের স্বাদটাই বড় হলো। এত বড় একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, তোর কাছে সেটা কিছুই না?

- ট্যাংরা মাছের স্বাদ আর তোমাদের সাজানো নির্বাচন এক হলো! কোথায় শেখ সাদী আর কোথায় বকরির লাদি। ধ্যাৎ আর খাব না, তোমরাই খাও। হাত ঝেড়ে উঠে গেল কিরণ। নাহারও উঠে গেল ছেলের পিছুপিছু। বাপ উঠল না, তবে রাগ দেখাল ঘাড় ফুলিয়ে। মনে মনে বলল, 'ওরে হারামি ছেলে, ছয়শো টাকা কেজির ট্যাংরা কি তোর বাপের টাকাতে কেনা। সে তো ভোট করা টাকাতেই কেনা।' এনতাজের কথা এনতাজ নিজেই শুনল, আর টেবিলটা সহ্য করল তার বাম হাতের থাবড়ানির ধকল।

যে নগরটাকে নিয়ে ফুটন্ত উত্তাপ আজ টিভির পর্দাতে বা অনলাইন পত্রিকাতে, সে উত্তাপের অর্ধেকও নেই সেই নগরে। ভোট হচ্ছে খবরে, ভোট হচ্ছে ভোটকেন্দ্রে, ভোট হচ্ছে ব্যালট পেপারে, ব্যালট বাক্সে। বাড়ছে হবু নগর-

পিতার ব্যালট পেপারের স্তূপ। এক দলের কাঁধে জয়ঢাক ঝুলিয়ে বাড়ি দেবার অপেক্ষা। অন্যদলের কাছে পূর্বের ঝোলানো খোল।

ভোট গ্রহণ শেষ হলো, উত্তেজনা বাড়ল। উত্তেজনা হার-জিতের নয়, উত্তেজনা একটি ঘোষণা শুনবার। এনতাজ আলীদের চোখেমুখে একটা দ্যুতি খেলা করে। আবার মনের মধ্যের চকমকি পাথরটা আপন মনে লাফায়। অন্য একটা পাথর কাছে এলেই হয়। ঘঁষা না লাগলেও জোর করে লাগাবে। চায়ের কাপে প্রমোশন, সিগারেটে প্রমোশন। পান না-খাওয়া মুখ আজকে খায় কাঁচা সুপারি দেওয়া পান। পূর্বের জানা খবরও যে একটা ঘোষণার মাধ্যমে শোনা কত সুখকর, তা আজ মর্মে বুঝতে পারছে বিজয়পথের যাত্রীরা।

ফলাফল এলো টিভির পর্দাতে। সময়ের আগেই এলো। জানা খবর জানালো টিভি। তবে ব্যবধানটা হলো অনেক। এত বেশি ভোটে না জিতলেও পারত তারা। ব্যবধানটা ১০ বা ১৫ হাজারের হলে নগদ দল মিডিয়াতে দাম পেত। এখন আর তা হলো না। তবুও আনন্দ। এনতাজ বাহিরে বেশি সময় থাকল না। বাড়িতে আজ যা যা রান্না হয়েছে, সবকটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। ভেসে উঠল মনে, নাকে আর পেটে। দুই পদের মাংস, ইলিশভাজা, বিরিয়ানির সৌরভ ইত্যাদি। টেবিলে একসাথে বসে খাবে চারজন। ভোট-উৎসবে যোগ দিতে মেয়ে রাখি এসেছে।

বাড়িতে ঢুকেই ডাইনিং টেবিলে এক-এক করে সব দেখল। বউয়ের দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে বাথরুমে গেলেও দরজা লাগাতে ভুলে গেল বিজয়ের আনন্দে। মুখ-হাত ধুতে ধুতেই সমস্ত দিনের ফিরিস্তি বলে চলে এনতাজ। গলা ফাটিয়ে বলে। বউ যেন রান্নাঘর থেকে শুনতে পায়। নাহার রান্নাঘরে শসা কাটছে।

এনতাজ খবরের একটা চ্যানেল ধরে টিভিতে ভলিউম বাড়িয়ে দিলো। খুব আয়েশ করে বসল খাবার টেবিলে। প্লেট সামনে নিল বটে, কিন্তু স্বস্তি পেল না। এতক্ষণে খেয়াল করল, কিরণ নেই। ঘরের দিকে তাকিয়ে বুঝল, ঘরেও নেই। কাউকে কিছু না বলেই ফোন করল। ফোনে কিছুটা রাগারাগি হলো। আর এই রাগারাগির ধরনে যা বুঝা গেল, তা হলো, কিরণের ফিরতে আরো কিছুটা দেরি হবে। কিরণ পাশের পাড়ার বন্ধুর বাসায় আছে। মা ও মেয়েকে খেয়ে নিতে বলে এনতাজ লাফ দিয়ে উঠল। নাহার বাধা দিলো কিন্তু এনতাজ শুনল না। ছেলেকে এনে তবেই একসাথে খাবে। এত পদ, এত স্বাদ, এত গন্ধ একা খেতে বিস্বাদ ঠেকবে।

বাড়িটা শহরের মধ্যে; কিন্তু শহর থেকে আলাদা। ভোট, ভোটের শোরগোল চলছে চারদিক, কিন্তু এখানে অনেকটা নীরব। বাড়ির পেছন

বারান্দায় খেলছে তারা। খেলছে কিরণ আর তার তিন বন্ধু। ক্যারামবোর্ড। বারান্দার অন্যপাশে দু'টি গাভী বাঁধা। চালের উপরে লাউগাছ। এনার্জি বাল্বের আলোতে স্পষ্ট দেখা যায়, বেশ কয়েকটি লাউ ধরে আছে। একপাশে কবুতরের কয়েকটি টং। কবুতর দেখা না গেলেও ডাক শোনা যায়। ডাকে বাদশাহি ভাব। এই বাড়ির মেজো ছেলে কিরণের বন্ধু। সে এগুলো পোষে। এনতাজ যতটা রাগ নিয়ে এলো, ততটাই ঠান্ডা হলো এখানে এসে। তারা চারজন বেশ নিমগ্ন ক্যারাম খেলাতে। আনন্দ-বন্যাতে চারদিক ভাসলেও তাদের ভিটে উঁচু ডিহি। আনন্দ-বন্যা ছুঁতে পারে না সেই ভিটা। চারজনেই এমএ। ভালো সাবজেক্টে খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়েছে তারা। এখনও কোনো অফিসের টেবিলে ঝুলতে পারেনি। তাদের বাপ বা দাদা, কেউ-ই মুক্তিযোদ্ধা ছিল না। ছিল না সরকারি পক্ষও। তারা কেউ প্রতিবন্ধীর সনদ অর্জনের যোগ্যতাও রাখে না। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঘরে জন্মালেও কথা ছিল না। উচ্চতা ও যোগ্যতায় খাটো হলেও কিছু না কিছু জুটে যেত। চিনচিন করে উঠল এনতাজের বুক। মলিন হলো মন। রাগ ভুলে কিছুটা হাসি মুখে দাঁড়াল ছেলের কাছে। তার মনে হলো, এরা ভোটের ফলাফল এখনও বোধ হয় জানে না। তাই সে অতি উৎসাহী হয়ে বলল, 'কিরণ, তোরা শুনেছিস, আমরা জিতে গেছি।'

- ও আচ্ছা। কিরণের এই সংক্ষিপ্ত নিষ্প্রাণ জবাবে হতাশ হলো এনতাজ। এত বড় নির্বাচন, এত বড় ফলাফল, এসব নিয়ে কোনো অভিব্যক্তিই এলো না কিরণের মধ্যে। এনতাজ ভেবেছিল তার এমন হঠাৎ আসাতে কিরণেরা অন্তত চমকাবে। কিন্তু চমকাল না। এমনকি আগ্রহ নিয়ে তাকাল না পর্যন্ত। না তাকিয়েই এমন উত্তর দিলো। তারা যেন আগে থেকেই জানত, এনতাজ আসবে।

- কী গো, তোমাদের ভাব দেখে মনেই হচ্ছে না, আজকে একটা নির্বাচন ছিল। মনেই হচ্ছে না, আমার কথা তোমরা শুনছ। এই কিরণ, এই, আমরা জিতেছি রে। মেয়র এবার আমাদের।

এমন সময় কিরণ মাথায় হাত দিয়ে ধপ করে বসে পড়ল। চুল আঁকড়ে ধরে বলল, 'ওহ, শিট!' আব্বা তোমার কাজ নেই। এখানে এসে বকবক করছ কেন? তোমরা পাশ করেছ তো কী হয়েছে? জাতিকে উদ্ধার করেছ, না? তোমার জন্যই রেডটা ফেলতে পারলাম না। গেমটা নির্ঘাত আমাদেরই ছিল। পড়া ঘুঁটি পড়ল না।' এনতাজ পাথর হয়ে দাঁড়াল। বুঝতে পারছে না এখন তার কী বলা মানাবে। ভাবতে পারেনি ছেলে এভাবে রেগে যাবে। শুধু বুঝল,

তার জন্যই কিরণ লাল ঘুঁটিটা ফেলতে পারেনি। তারপরেও কিছুটা কাতর হয়ে বলল, 'কিরণ, কী বলছিস তুই। এতবড় খবরের চেয়ে তোর রেডটাই বড় হলো?'

- এই রেড পয়েন্ট পেলে আমাদের অবশ্যই গেম হতো। তুমি জানো, খেলার এই পর্যায়ে রেড পয়েন্টের কত মূল্য?
- তার মানে? একটা মেয়র নির্বাচন হলো, আমাদের দল থেকে মেয়র হলো। আর এর থেকেও তোর রেড পয়েন্টের দাম বেশি? এই তোরা কিছু খেয়েছিস নাকি?
- ধ্যাৎ, কী যা-তা বকছ। তোমরা মেয়র করো আর প্রধানমন্ত্রীই করো, তাতে আমাদের কী? আমার রেড পয়েন্ট তাদের থেকেও দামি। তুমি যাও এখান থেকে। মাথা খারাপ করো না।
- মাথা খারাপ বলছিস কী রে, মাথা তো খারাপ হয়েই গেছে। শীঘ্রই বাড়ি চল।
- কী অশান্তি শুরু করলে। যাও বলছি।'

উলটো ধমক দিলো বটে, কিন্তু সেই সাথে জোরে ঘুষি মারল বোর্ডে। মুখে উচ্চারণ করল একটা বাজে শব্দ। তবে কথাটা কেউ স্পষ্ট শুনতে পেল না। খেলার বোর্ড ভাঙার শব্দে গালিটা উড়ে গেল। বোর্ডে তখন তিনটি ঘুঁটি ছিল। লাল, সাদা, কালো। উড়ে গেল ঘুঁটি তিনটি। উড়ে গেল রেড। উড়ে গেল রেড পয়েন্ট। উড়ে গেল নির্বাচন; উড়ে গেল মেয়র। উড়ে গেল খেলা। এখন চলছে একটাই খেলা। শুধুই ওড়াউড়ির খেলা। খোপে ডাকন্ত কবুতরগুলোর কণ্ঠ থেমে গেল। জাবরকাটা থামাল গাভি। একটা পাখিও বোধ হয় উড়ে গেল লাউগাছের পাতার আড়াল থেকে। এনতাজও উড়তে পারত। কিন্তু সে এখন কাঁপছে। ছেলেকে একজন সাইক্রিস্ট যে দেখাতে হবে, এ বিষয়ে সে নিশ্চিত হয়েছে। কোন ডাক্তারকে দেখাবে এটাও সে ভেবে নিল। এনতাজ এক-এক করে সামনে কিছু বিষয় সাজাল— নির্বাচন, মেয়র, রেড পয়েন্ট, চাকরি, চিকিৎসা। কোনটাকে সে সামনে রাখবে ভেবে পেল না। তবে বারবার সাজাতে লাগল ক্রমানুসারে; ক্যারামের ঘুঁটির মতো।

"বাংলাদেশের মুক্ত আত্মা দাসদের পায়ে পিষ্ট
নেকড়ের দল সাধু সেজে সেজে কথা বলে খুব মিষ্ট
ভণ্ড এবং ষণ্ডের হাতে প্রেম-প্রীতিগুলো ক্লিষ্ট
পরগাছা পাঁঠা সবকিছু খেয়ে হচ্ছে পুষ্ট-হৃষ্ট"

–ডাক

কালো মেহেদি

স্টলটা তখনও জ্বলেনি। স্বাধীন অধিকারীর চায়ের স্টল। স্বাধীন তো স্বাধীনই। তার যখন ইচ্ছা হবে তখন সে জ্বালবে। যখন ইচ্ছা নিভাবে। সকালে চুলা জ্বালতে জ্বালতে ১০টা। বিকালেও তা-ই। শীতের দিনে ৪টা তো গরমের দিনে ৫। হেরফেরও হয়। মোটকথা, তার ইচ্ছামতো জ্বালা বলে কথা। স্বাধীনের অর্থনৈতিক সংকট যে নেই, তাও নয়। ধানি জমি নেই এক ছটাকও। এই দোকানই ভরসা; তিন-ফসলা জমি। অবশ্য মৌসুমে পৌরোহিত্যও করে। বিশেষ করে দূর্গাপূজার সময়। এতে কয়েকজোড়া নারকেল, থানের কয়েকখান কাপড়, গামছা, ধুতি, কিছু নগদ টাকাও জোটে। নড়বড়ে সংসারে ঠেস দিতে বেশ কাজে লাগে এগুলো। মোটকথা টানা-হেঁচড়াতেই চলে তার সংসার। তবুও স্বাধীন। তাড়াহীন, গতিহীন।

স্বাধীনের অধিকাংশ কাস্টমারই বাঁধা। তারা দোকান খোলার আগে এলেও চুপ করে বসে থাকে স্বাধীনের অপেক্ষায়। দোকান খোলা না বলে জ্বালা বলাই ভালো। কারণ দোকান খোলা থাকে সব সময়। বাঁশের আটটি খুঁটির ওপর খড়ের দোচালা ছাউনি। ছাউনির নিচে কয়েকটি বেঞ্চি পাতা। চারদিক ফাঁকা। কাস্টমারদের বসবার তাই অসুবিধা হয় না। স্বাধীন না এলেও হয় না। বলা চলে আড্ডা দেবার জুতসই জায়গা এটি।

অন্য দিনের তুলনায় আজকে বাজারে লোক বেশি। লোক বেশি স্বাধীনের স্টলেও। কয়েকদিন ধরেই বাজারে লোক সমাগম বেশি।

গ্রামের শেষ মাথায় ছোট বাজার। শনি, মঙ্গল, দুই দিন হাটবার। তবে বাজার প্রতিদিন। সকালে-বিকালে লোকের কমতি হয় না। কাজের দিনে সকালে একটু কম হলেও বিকালে তা পুষিয়ে যায়। তবে বর্তমানে যেকোনো সময়ের থেকে লোক সমাগম বেশি। কী সকালে কী বিকালে। আজকে আরো বেশি। আগামীকাল ভোট। ভোটের আগের দিন বিকালে সবার বাজারে আসবার তাড়া আছে। তাড়া আছে স্টল দখল করবারও। তাড়া দোকানির, তাড়া কাস্টমারের। তাড়া শুধু নেই স্বাধীনের। সে তখনও আসেনি। কেন যে বাপ-মা স্বাধীন নামটা রেখেছিল। এ কথা ভাবে সবাই। স্বাধীন অবশ্য নামের সার্থকতা রক্ষা করবার চেষ্টা করে চলে। বাপ মা কত হাউশ করে নামটা রেখেছিল। স্বাধীন জন্মেছিল স্বাধীনের বছর। স্বাধীনের মা বলত গন্ডগোলের বছর। হিন্দু পালানোর বছরও বলে।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর জন্মেছিল স্বাধীন। তখন তারা ভারতে শরণার্থী শিবিরে। বাবা এন্দুর ঠাকুর ছেলের নাম রাখলেন স্বাধীন। স্মরণীয় করে রাখতে চাইলেন দিনটিকে, বছরকে আর মুক্তিযুদ্ধকে। ছেলের দিকে তাকালে যেন স্বাধীনতাকে দেখতে পান ঠাকুর। তাই এই নাম। এন্দুর ঠাকুর মারা গেছেন। তবে যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন স্বাধীনতার দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। মৃত্যুর দিনেও এক ধ্যায়ানে তাকিয়ে ছিলেন তার স্বাধীনতা এই স্বাধীনের দিকে। স্বাধীন সেদিনের কথা এখনও বুক উঁচিয়েই বলে, বাবা মৃত্যুর দিন তাকিয়ে তাকিয়ে তাকে কী বলেছিল। বাবা তাকে বলেছিল, 'বাবা স্বাধীন, স্বাধীন হয়েই থেকো।' লোকজন তার ধীর গতি দেখে ঠাট্টা করলে সে হাসতে হাসতে ঐ কথাটাই বলে। বাবা মারা যাবার পর থেকে তাকিয়ে থাকলেন মা— তার স্বাধীনের দিকে, তার স্বাধীনতার দিকে।

অবশেষে এলো স্বাধীন। স্বাধীন স্টলে ঢুকতেই সবাই নড়েচড়ে বসল। সবার মুখেই হাসির রেখা। না, এ হাসি চা না পাবার অপেক্ষা শেষ হবার হাসি নয়, স্বাধীনের স্বাধীনতাকে ঠাট্টা করবার হাসি। এস্তাকুল চাদর মুড়িয়ে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে ছিল। এস্তাকুল বেতন না হওয়া কলেজের শিক্ষক। প্রায় বিশ বছর বেগার খাটছে। সে মুখের চাদরটা খানিক আলগা করে স্বাধীনকে বলল, নামটা রাখা বাপ-মায়ের সার্থক হয়াছে গো। এস্তাকুলের কথায় সবাই মুখ টিপে হাসলেও স্বাধীন কথা বলল না। সেও হাসল। এমন কথা তার নিত্য শোনা। সে চুলাতে খড়ি সাজাতে ব্যস্ত। হাবিব মাস্টার একটু রাগ নিয়েই বললেন, 'ক্যারে বা ঠাকুরের বেটা, ভোটের ক'টা দিন তো সকাল

সকাল আসতে পারো? আম কিন্তু ঝড়ের সময়ই কুড়াতে হয়। তুমি সকালেও আসো দুপুর করে।' হাবিবের কথা শুনে স্বাধীন কিছু একটা বলতে যাবে, এমন সময় আজিজুল তাকে বলতে দিলো না। আজিজুল বেশ ঠোঁটকাটা। মাদ্রাসার শিক্ষক। পঁচিশ বছর ধরে তিনিও বেগার খাটছেন। বেতন হয়নি। দু'পাঁচ বছর পর ঐ মাদ্রাসার অনেকেই অবসরে যাবেন। এমপিও'র মুলা দেখতে দেখতেই পঁচিশ বছর গেল। আজিজুল হাবিব মাস্টারকে বলল, 'আপনার যেমন কথা। স্বাধীন সকাল সকাল আসুক আর ওর বেটির ঠান্ডা লাগুক। স্বাধীন সকালে বাড়িতে কত কাজ করে জানেন? উঠোন ঝাড়ু দেওয়া, বাসন মাজা, আখার ছাই তোলা; কত কী। শুধু কি তাই, বাড়ির চুলা গরম করে তবেই আসে দোকানের চুলা গরম করতে।' আজিজুলের ঠাট্টা সবাই বুঝলেও স্বাধীন এতে খুশি হলো। স্বাধীনের খুশি দেখে বসে থাকারা খুশি হলো না। তারা ভেবেছিল, স্বাধীন এবার রেগে যাবে। দু'কথা শোনাবে আজিজুলকে। হাবিব মাস্টার আজিজুলকে আরেকটু উসকাতে চাইলেন। 'মেয়ের ঠান্ডা লাগার সাথে দোকানে আসার কী সম্পর্ক? বাড়িতে বউ নাই?'

- বউ বিছানা থেকে উঠলেই তো মেয়েকে ঠান্ডা লাগবে। এমনিতেই নামলা বাতের বেটি।' আজিজুল কথাটা বলতেই স্বাধীনের মুখে কথা এলো এবার। নড়ে উঠল স্বাধীন। খাপে পেয়েছে হাবিব মাস্টারকে। দু'কথা না বলে থামবে না। —'কাকে কী বুলছো আজিজুল কাকা? এরা তো আমার বেদনা বুঝে না। আজগুবি বকবক করে।' এবার হাবিবের দিকে মুখ করে বলল, 'তুমাক মাস্টার কর্যাছে কে বারে? সহজ জিনিসটা বুঝেন না। আমি সকাল সকাল দোকানে আসি আর তোমার বউমা বাড়ির সব কাজ করুক, এইটাই তো নাকি? কিন্তু আমার বেটিকে ধরবে কে? বেটির নিউমোনিয়া হলে দেখবে কে, ডাক্তারের কাছে নিবে কে? সকালে এসে দশ টাকা ইনকাম করতে আইসা ডাক্তারকে দু'হাজার দিই আরকি। আমার দরকার নাই অত আয়ের। আপনাদের আশীর্বাদ থাকলেই চলবে।'

স্বাধীনের কথা কারও কারও ভালো লাগল। কোনায় বসা করিম চেয়ারম্যান মুখ ঢেকে হাসছে। তার বাড়ি স্বাধীনের বাড়ির দেওয়াল ঘেঁষা। করিম তার সংসারের অনেক খবরই জানে। অনেক ঠোকাঠুকির সাক্ষী সে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কয়েকবার মীমাংসাও করে দিয়ে এসেছে। স্বাধীনের বউয়ের বাপের বাড়ি যাওয়া আটকিয়েছে। করিম অবশ্য ভোটে পাশ করা চেয়ারম্যান নয়। ফেল করাও নয়। কোনোদিন প্রার্থীও হয়নি। তবুও সবাই চেয়ারম্যান

ডাকে। সে বেজার হয় না। বরং খুশি হয়। তবে তার কাজকারবার চেয়ারম্যানেরও অধিক। সুখ-দুঃখে সবার পাশে থাকার চেষ্টা করে। সবাই ডাকেও। সব সময় হাসিখুশি। লেখাপড়া তেমন জানে না। তবে কথাবার্তার ধরনে বুঝবার উপায় নেই সেটি। সে ক্ষমতাসীন দলের লোক। নগদ দলের ওয়ার্ড সভাপতিও। করিম নির্দিষ্ট দলের হলেও সবার সাথেই মিলেমিশে থাকে। স্বাধীনের স্টলও মিলমিশ স্টল। সব দলের লোকই বসে। এখানে শিক্ষক, দলীয় নেতা আর সমাজের ওপরের কিছু লোক বসে। ছোটরা তেমন আসে না। এটা ছাড়াও আরো সাতটি স্টল বাজারে। ওগুলোতে বাকিরা বসে। স্বাধীনের কথা শুনে করিম কিছু একটা বলতে যাবে, এমন সময় স্টলে ঢুকল ইসমাইল। নগদ সরকারের বিপরীত পক্ষের লোক। তাকে বেশ উসকোখুশকো লাগছে। সবাই তার দিকেই তাকাল। অরবিন্দ অধিকারী জিজ্ঞাসা করল, 'কুনঠে থাইক্যা বারে?'

'শহর থাইক্যা কাকা।' সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে হাবিবের পাশে বসল।

'আপনার অবস্থা দেখে তো মনে হচ্ছে, উল্যার বিল থেকে মাছ ধরে আসলেন।' হাবিব মুচকি হেসে বললেন কথাটা।

'তোমার তো সব সময় রস এসেই থাকে, পারলে তুমি যাও মাছ ধরতে। আমার অত রং লাগেনি।' ইসমাইল ঠান্ডা মাথার মানুষ। সে সহজে রাগে না। আজকে কথা বলার ঢং দেখে মনে হলো সে আগে থেকেই রেগে আছে। এর মধ্যেই স্বাধীনের চায়ের পানি ফুটতে শুরু করেছে। ক'কাপ চা ধরবে তার জন্য সবাইকে একবার দেখে নিল স্বাধীন। সে জানে কে কী চা খায়। কে চিনি বেশি কে চিনি কম কিংবা কে চিনি ছাড়া।

চায়ে প্রথম চুমুক দিয়ে হাবিব মাস্টার ইসমাইলের দিকে ভালো করে খেয়াল করলেন। পকেটে উঁচু হয়ে থাকা কী একটা দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করলেন। যেন কথা বলার জন্যই করা। —'ভাই, আপনার পকেটে ওটা কী?'

'মেহেদি।' কিছুক্ষণ থেমে হুট করে বলল কথাটা। কী ভেবে হঠাৎ মেহেদির নামটাই মুখে এলো। যেটা আছে তার নাম বললে হয়তো আরো দশ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তাই মেহেদির কথাই বলল। কিন্তু রেহাই পেল না ইসমাইল। প্রশ্ন করবার মতো মুখ চারপাশে থাকলে সেটা আটকায় কে? করিমই প্রথম প্রশ্ন করল, 'কী রে বাবা, তোমার বেটি তো বড় হয়নি যে বিয়ে দিবা। মেহেদি কী হবে? ঈদও তো ধারে কাছে নেই, তোমার বেটির হঠাৎ মেহেদি লাগল কেন?'

'বেটির নয় কাকা, আমার।' এবার সবাই তাকাল ইসমাইলের দিকে। হাবিব তাকালেন করিমের দিকে। তবে ফোড়ন কাটতে ছাড়লেন না। ফোড়ন কাটাতে হাবিব মাস্টারের জুড়ি নেই। ফাঁক পেলেই ঢুকে পড়েন।—' করিম ভাই, চাঁদরাত কার যে কখন আসে বলা মুশকিল। মনে রং থাকলে যা হয় আরকি।' হাবিব করিমের দিকে তাকিয়ে বললেও ফোঁড়টা গিয়ে ঠেকল ইসমাইলের গায়ে।

'খুব চুলকাইছ তাই না? এই শালা, কালকে এত বড় একটা আনন্দের দিন, তোমার মুনেই লাগছে না? ভোটের খুশিতে নাচছে সারা দেশ। আজ চাঁদরাতই তো। বাঙালির সবচেয়ে খুশির দিন হলো ভোটের দিন। ঈদকেও হার মানায়। মেহেদি না হলে চলে?' এই কথা শুনে সবাই চুপ মারল। একজন আরেকজনের দিকে চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল শুধু। সবাই বুঝল, যে কারণেই হোক ইসমাইল বিগড়ে আছে।

বেশ কিছু সময় এভাবে কাটল। এর মাঝেই একজন স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী ঢুকল স্টলে। সালাম বিনিময় করল, চা খেল, খাওয়াল। অবশ্য ইসমাইল খায়নি। প্রার্থী বিদায় হতেই ইসমাইলের দিকে তাকিয়ে এস্তাকুল বললেন- 'আপনার পকেটের ওটা কি সত্যিই মেহেদি? আমার কিন্তু তা মনে হোছে না।' এস্তাকুল ঝিম ধরে বসে থাকলেও তার চোখ কিন্তু সবার আগে। কেউ কেউ বলে তার নাকি মাছির চোখ। চারদিকে দেখতে পান। সব খবর তার কাছে থাকে। অথচ মনেই হবে না, এমন একটা খবর তার মতো ঝিমধরা মানুষের ঝুলিতে থাকতে পারে।

'কেন, তোমার কী মনে হোছে?

'আমার অন্যকিছু মনে হোছে। মেহেদির টিউব এত লম্বা হবে কেন?'

'তোমরা বড় বড় পাশ দেওয়া লোক হতে পারো, কিন্তু কখন কোন মেহেদি বের হয় তার খবর তোমরা জানো না। এটা এই সময়ের মেহেদি। আপডেট।'

'বড় মেহেদি বিশারদ হয়ে গেছ মনে হয়? তা কী মেহেদি দেখি।' হাবিব হাত বাড়িয়ে দিলেন ইসমাইলের দিকে। ইসমাইলও কোনোকিছু না ভেবে টিউব দুটি হাবিবের হাতে দিলেন। সেটা হাতে নিয়েই চমকে উঠলেন হাবিব। চমকে উঠল বোধ হয় সবাই। এ আবার কেমন ঠাট্টা। সবাই হো হো করে হেসে উঠতেও পারত। উঠল না।—'কি গো ভাই এ আবার কেমন মেহেদি, এ যে মার্কার পেন!'

'ক্যান, মার্কার খালি মাস্টারদেরই লাগে, আমার লাগতে পারে না?'

'তা লাগতে পারেই তো, কিন্তু এ যে পারমানেন্ট মার্কার।'

'আমার এটাই লাগবে। মেহেদি বলে কথা। দাও তো।' কথাটা বলেই হাবিবের হাত থেকে কলম দু'টি বলা চলে কেড়েই নিল ইসমাইল। সে উঠে দাঁড়াল। আর থাকা যাবে না। আরো হাজারও কথা উঠতে পারে এই নিয়ে। তবে লোকজন তেমন কিছু বলল না। তারা যা ভাবল, তা হয়তো ইসমাইলের সামনে বলা যাবে না। ইসমাইলের বড় ভাই মারা যাবার পর তিনমাস কেমন আধাপাগলা হয়েছিল। মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছিল। এত বছর পর আবার সেটা জাগলেও জাগতে পারে। এমনই ভাবল কেউ কেউ। ইসমাইল পা বাড়াতেই অরবিন্দ বলল, 'কালকে কিন্তু ভোটটা দিতে যেও বাপু।'

'তা তো যেতেই হবে কাকা। না গেলে কি হয়, এত বড় উৎসব। না গেলে যে আমাদের বাড়িতে সবাই উৎসব করতে আসবে। আতশবাজি হবে।'

'কী সব বাজে কথা বলো সোজা কথা বলতে জানো না, তাই না?' করিম রেগে গেল।

'আমি যে লোকটাই বাঁকা।' আর থামল না ইসমাইল। করিম বাদে সবাই বোধ হয় এটাই চাচ্ছিল। ইসমাইল চলে যাক।

ইসমাইলের কথা কেউ বুঝল, কেউ বুঝল না। যারা বুঝল তারা জানে, গেলবার তার বাড়িতে কী ঘটেছিল। তারা জানে গত নির্বাচনের পরের ঘটনা।

গত নির্বাচনে অধিকাংশ লোকই ভোট দিতে যায়নি। যদিও কাগজে-কলমে বেশিই ছিল। ভোট দিতে যায়নি ইসমাইলের পরিবার। ভাই-ভাগ্নিরাও যায়নি। ভোটের প্রতি অরুচি জন্মেছিল সবার। গতবারের আগের বার সাধারণ মানুষ দেখেছে, শুধু ভোট দিয়েই কাউকে জেতানো যায় না।

গতবার ভোট দিতে যায়নি ইসমাইলের পরিবার। এতে ক্ষেপে ওঠে জয় আনারা। রাগ সবার প্রতি হলেও বেশি জন্মেছিল ইসমাইলের প্রতি। ভোটের পরদিন রাতেই আগুন জ্বলেছিল ইসমাইলের বিশাল খড়ের গাদায়। আর একটু হলেই বাড়িতেও আগুন লাগত। অনেকেই ছুটে এসেছিল আগুন নিভাতে। নিভানোর দলে অগ্নি সংযোগকারীদেরও কেউ কেউ ছিল। ইসমাইল আগুন নিভাতে দেয়নি। বাকশূন্য দাঁড়িয়ে থেকে দেখেছে জ্বলন্ত আগুন। যেন আতশবাজি দেখছে নির্বাক হয়ে। দুইদিন ধরে গুমড়ে গুমড়ে জ্বলেছিল আগুন। ধোঁয়াতে বেশ আঠালো হয়েছিল চারদিকের বাতাস। ইসমাইলের বুকের মধ্যে সেই আগুন এখনও জ্বলছে। আরো তীক্ষ্ণ আরো তীব্র।

আগামীকাল ভোট। সরকারদলীয় প্রার্থীদের একই কথা, আর ভুল করা যাবে না। কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি বাড়াতেই হবে। ফলাফল তো হবে কাগজে-কলমে। সে তো পরের ঘটনা। তার আগে বিভিন্ন মিডিয়াকে অন্তত দেখাতে হবে ভোটারের উপস্থিতি। যে মূল্যেই হোক, উপস্থিতি বাড়াতে হবে। বাছাধন, ভোট যাকে ইচ্ছা দাও, অন্তত উপস্থিত থাকো। লাইন লম্বা করো। বাড়ি বাড়ি গিয়ে একই ছবক দিচ্ছে কর্মীরা। বুঝিয়েই হোক আর হাত-পা ধরেই হোক, কিংবা ঘাড় ধরেই হোক আর ভয় ধরিয়েই হোক; ভোটারকে কেন্দ্রে নিতে যা যা করা দরকার তার সবই করছে কর্মীবাহিনী। ভোটকেন্দ্রে না গেলে যে উলটো কিছু ঘটতে পারে, সেটিও বুঝাতে ছাড়ছে না তারা।

ভোট হলো পরদিন। যতটা ভিড় হলো কেন্দ্রে তার অধিক হলো আইনের সীমানার বাইরের দোকানে। যারা ভোটকেন্দ্রে গেল তাদের কেউ গেল পছন্দের কামরাতে ছাপ মারতে, কেউ গেল ভোট নষ্ট করতে, আবার কেউ গেল ভয়ে। ঠিক হাজিরা দেবার ঢঙে, হাতে কালি লাগাতে। উৎসবের রং বলে কথা। মুশকিল আছানের রং।

ভোট শেষ হলো। গণনাও হলো। ভোটার উপস্থিতি একেবারে কম ছিল না। অন্তত স্থানীয় নেতারা ওপরমহলে বলতে পারবে, তারা ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু মুশকিল হলো ভোট গণনা করতে গিয়ে। ভোট প্রায় তিনভাগে বিভক্ত। একভাগ ব্যালট সাদা, একভাগ নষ্ট, আর তিন নম্বর ভাগটা সঠিক। বিজয় মিছিল একটা ঠিকই হলো। স্বস্তির মিছিল না হলেও হলো। তবে ভোটের এই তিনভাগ নিয়ে কোনো নেতার কিছু বলবার রইল না। কে সিল মারল কে মারল না, আবার কে একটার জায়গায় তিনটা সিল মারল, তা যাচাই করা মুশকিল। সিসি ক্যামেরা লাগাবার আইন এখনও পাশ হয়নি। তবে ক্ষোভ জন্মাল অন্যখানে। এত ছুটাছুটি, এত হাত-পা ধরা, এত ভয় দেখানোর পরেও কেন অর্ধেক লোক ভোটকেন্দ্রে। আর অর্ধেক তবে কী করছিল? এই অর্ধেক লোককে আগে খুঁজে বের করতে হবে। প্রয়োজন হলে সার্চ কমিটি গঠন করতে হবে, আঙুলের কালিহীন লোকগুলো খুঁজতে। এমনই সিদ্ধান্ত হলো পাতি নেতাদের মধ্যে।

বিভিন্ন কায়দায় দেখা শুরু হলো। বাড়িতে, বাজারে কিংবা জমির আলে। সুযোগ পেলেই কায়দা করে হাত দেখে নেয়। বাদ পড়ল না কেউ। তবে রংহীন লোক খুঁজে পায় না কেউ। সবার বৃদ্ধা আঙুলেই অমোচনীয় কালো কালির দাগ। যাদের সন্দেহের তালিকায় রেখেছিল, তাদের কাছেও গেল। কিন্তু দাগ সবার হাতেই। তারা যেন ইচ্ছা করেই হাতটা আলগা করে রাখে দেখনেওয়ালার দিকে। সহজেই চোখে পড়ে অমোচনীয় কালি। সার্চ কমিটির সদস্যরা যেন আলীবাবা চল্লিশ চোরের কোনো সিরিয়াল দেখছে। যেখানে

সবাই সাধু আর তারা চোর। এমন কি আশি পার করা ফতে বুড়িও তাদেরকে ঠাট্টা করল। দাঁতহীন ফোকলা বুড়ি বাম হাতের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হিসহিস করে হেসেছিল। তারা হিসাব মিলাতে পারে না। ভোট কেন্দ্রে গেল পঞ্চাশ, অমোচনীয় কালি পড়ল একশ'র হাতে। হিসাবটা সহজ করতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। জটটা বড়ই এলোমেলো। একদিকে খুললে আরেকদিকে আটকে যায়। এ যেন বন বরইয়ের কাঁটার জট। মাথার চুল ছিঁড়েও এর সুরাহা হয় না।

সেবার অবশ্য কারও খড়ের গাদাতে আগুন জ্বলেনি। বাড়িতেও নয়। আগুন যা জ্বলেছিল তা নগদ নেতাদের মনে।

"তোমার হিংস্র কুৎসিত হাতে আমার শিশুর খুন
কুম্ভীরাশ্রুতে তুমি জঘন্য সুনিপুণ ।
ঘাতক তোমার দিন আজ শেষ হবে
জেগেছে মানুষ গাছপালা পাখি কোটি কোটি কলরবে ।"

–ঘাতক

রোদের ছায়া

টাকাপোড়া গ্রাম । জেলা যখন রাজবাড়ী তখন রাজ-রাজাদের রমরমা একদিন যে ছিল তা বলা যায় । টাকা-পয়সার ঝনঝনানি থাকবে এটাই স্বাভাবিক । তবে ঐ গ্রামে কোনোদিন টাকার স্তুপ পুড়েছিল কি না সে কথা কেউ জানে না । কেন গ্রামের নাম টাকাপোড়া হলো তাও জানে না । এ বিষয়ে মাথা যে কেউ ঘামায়নি তাও নয় । হদিস করতে পারেনি । যা পারে, তা ভাসা ভাসা । তবে এখন হঠাৎ একটা কথা জাগন্ত হয়ে উঠল । টাকাপোড়া গ্রামের এক বৃদ্ধ বোধ হয় মুখ ফসকেই বললেন, এটা কপাল পোড়া গ্রাম । লোকটার কথা শুনে কেউ কেউ থমকে গেল । এর ওর মুখের দিকে তাকাল কেউ কেউ । কেউ কিছু বুঝল, কেউ আবার কিছুই বুঝল না । কেউ আবার বুঝতে চেষ্টাও করল না । তবে দুই-একজন তাকিয়ে থাকল কথা বলা বৃদ্ধের দিকে । আবার কেউ মনোদৃষ্টিতে তাকাল তোফাজ্জলের দিকে; তোফাজ্জলের কপালের দিকে । সত্যিই তোফাজ্জলের কপালে এখন অসংখ্য পোড়াচিহ্ন ।

সাগর আর নুশমি ভাই-বোন । সাগর বড় । বোন ছোট । পিঠাপিঠিও বলা চলে । নুশমি সাগরের বেশ গা-লাগা । মাঝে মাঝে ভাইবোনে ঠোকাঠুকি হলেও নুশমি সাগরের পিছু ছাড়ে না । ভাই-ন্যাওটা বোন । ভাই এখন কাছে থাকে না । দূরের শহরে থাকে । রাজধানী শহরে । নুশমির মনে ভাই না থাকার

কষ্ট থাকলেও, একটা গর্ব পুষে রাখে। ভাই রাজধানীতে থাকে। মিরপুর সরকারি বাঙলা কলেজে অনার্সে পড়ে। আর ক'দিন বাদে তাকেও নিয়ে যাবে। কোচিং করাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়েই ছাড়বে। ভাইয়ের খুব ইচ্ছা ছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার। পারেনি। নুশমিকে দিয়ে সেই সাধ মিটাবে। নুশমি ঘাসফড়িংয়ের মতো এ পাড়া ও পাড়া ঘুরে আর একে ওকে বলে বেড়ায় ভাইয়ের স্বপ্নের কথা। নুশমির কথা শুনে কেউ নাক সিটকাই, কেউ হাসে। নুশমি মনে মনে রাগে। বলে, তোমরা যতই হাসো; কদিন পরেই টের পাবে, আমি নেই। ঠিকই চলে গেছি ঢাকা।

মন দিয়ে পড়ে নুশমি। যতটা নিজের জন্য তার অধিক ভাইয়ের জন্য। ভাইয়ের মুখ রক্ষা করতেই হবে। দরিদ্র বাবা মেয়েকে শহরে ভর্তি করাতে পারেননি। বেশ টানাহেঁচড়া হয় সংসার চালাতে। তাই নুশমিকে দিয়েছেন গ্রামেরই এক কলেজে।

বারান্দায় খেতে বসেছে চারজন। সাগর, নুশমি আর বাবা-মা। সাগর গতকাল এসেছে ঢাকা থেকে। সাগর এভাবে সাধারণত আসে না। আসে দুই ঈদে। সময় নেই বাবা টাকা দিতে পারে না। প্রথম দুই তিন মাস দিলেও এখন আর দেয় না। দিতে পারে না। সাগর টিউশনি করে। আবার পার্টটাইম একটা কাজ ধরেছে এখন। ইচ্ছা করলেও আসতে পারে না। আজ হঠাৎ এলো কোনো খবর না দিয়ে। মা-বাবা কিছুটা অবাক হয়েছেন এতে। খুশি হয়েছে নুশমি।

বাড়ির লাল মোরগটা জবেহ করা হয়েছে আজ। সাগরের কড়া নিষেধ ছিল এ বিষয়ে। বাড়ির বড় মানান ছিল মোরগটা। কানে দুল দিয়ে দিয়েছিল নুশমি। এতে মোরগটাও খুব দেমাগি হয়েছিল। হাঁটত দুল ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে। চলনে বলনে সাহেবি কায়দা। বাকও ছাড়ে একই ঢঙে। সাগর বাড়িতে এলে অনেকক্ষণ গোলাপী বেগম তাকিয়ে ছিলেন সাগরের মুখের দিকে। চোয়ালটা কেমন জেগে উঠেছে। মুখটা বেশ শুকনা। যেন কতদিন ছেলে তার ভালোমন্দ খায়নি। মা বলেছিলেন, বাবা তুমি অনেক শুকিয়ে গেছ। সাগর এর উত্তরে কিছু বলেনি, মুচকি হেসেছিল। নুশমি আর গোলাপী যুক্তি করে মোরগটা ধরেছে। মা ছেলেকে আর বোন ভাইকে মোরগের মাংস খাওয়াবে। সাগর এ নিয়ে কথা তুললে কী উত্তর দিবে তাও ঠিক করে রেখেছেন মা-মেয়ে।

স্বামী তোফাজ্জল ও সন্তানের প্লেটে গরম ভাত তুলে দিচ্ছেন গোলাপী। মাংসও তুলে দিলেন। নুশমি ও সাগরের প্লেটে দিলেন দুই রান।

তোফাজ্জলের পাতে অন্য মাংস। সাগর অবাক হয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকায়।

- মা এটা কীসের মাংস?
- মোরগের। কিছুটা দ্বিধা নিয়ে বলেন মা।
- মানে! আমাদের মোরগের মাংস?
- আর বলিস না বাবা, মোরগটা ভিন্ন পাড়াতে যায়। মাঝে মাঝে বাড়িতেও আসে না। কে কখন খেয়ে নেয় তার ঠিক আছে। তার চেয়ে আমরাই খাই।
- তাই বলে এটা?
- চোখ বুজে খা তো। মোরগ তো আরো আছে। সেখান থেকে একটা রেখে দিব। সাগর আর কথা বলল না। সে নুশমির দিকে তাকাল। সাগর ভেবেছিল নুশমি তার পক্ষ নিবে। কিন্তু নুশমির দিকে তাকিয়ে দেখে, সে মিনি বিড়ালের মতো হাসছে। তার বুঝতে বাকি থাকে না, নুশমি আর মা মিলেই এমনটি করেছে। সাগর প্লেটে হাত দিতেই নুশমি একটা কাণ্ড করে বসল। তার প্লেট থেকে মোরগের রানটা তুলে সাগরের প্লেটে দিলো।
- ভাইয়া তুমি এটা খাও। সাগরের বুক ভারী হয়ে উঠল। চোখে বোধ হয় পানিও এলো। সেটা বুঝতে দিলো না কাউকে। বরং খেঁকিয়ে উঠল নুশমির দিকে তাকিয়ে।
- সব আমি গিলব না। মারব এক থাপ্পর। ঠিক হয়ে খা বলছি। বলেই রানটা আবার নুশমির পাতে ফিরিয়ে দিলো।
- ভাইয়া তোমার শরীরটা বেশ শুকিয়ে গেছে। কালো হয়ে গেছে চোখমুখ। তোমার বেশি বেশি খাওয়া দরকার। কাঁদো কাঁদো মুখে বলল নুশমি।
- হ্যাঁ, শরীর তো আমারই শুকিয়ে গেছে। তোর শরীর ধুমধুম করছে? বেশি পাকামি করবি না, ঠিক হয়ে খা। বাবা-মা, ভাই-বোনের এসব দেখে মনে মনে হাসেন। তারা কিছু বলেন না। সাগর তখনও মুখে ভাত তুলেনি। প্লেট হতে ভাপ উঠছে। সাগর বাবার মুখের দিকে তাকায়। ভাতের ভাপে বাবার মুখ ঝাপসা দেখে। অচেনা ঠেকে বাপকে। তবুও তাকিয়ে থাকে সাগর। আজ দুপুরে ভালো করে খেয়াল করেছে বাপকে। রোদে পুড়ে বাপ তখন বাড়িতে ঢুকছিল। কালো ঘামার্ত শরীর তখন তামাটে। মাঠের আগুনে রোদের সাথে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে একটু জিরিয়ে নিতেই যেন বাড়িতে এলো বাপ। আবার লড়াই হবে খানিক বাদে। রোদকে হারাতে পারলে